কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ১৪-০১-২০২৫ (বিশেষ সংখ্যা পৃঃ ০৪)

গ্রাফিতি : সিদ্ধেশ্বরী স্কুল, ঢাকা

ছবি : মোহাম্মদ আসাদ

■ জলবায়ু

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের কৃষি : সংকট ও করণীয়

ড. মোহাম্মাদ কামরুজ্জামান মিলন

কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষি-জলবায়ু বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক আবহাওয়ার চেনা ছন্দে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মরুভূমিতে বৃষ্টি ও সবুজায়ন এবং ইউরোপের শীতল অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এর উদাহরণ। ২০২৪ সাল হতে পারে রেকর্ডকৃত উষ্ণতম বছর, যেখানে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় ১.৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। তুলনামূলকভাবে ২০২৩ সালে একই সময়ে এই বৃদ্ধি ছিল ১.৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই পার্থক্য নির্দেশ করে যে ২০২৪ সালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি আরো তীব্র হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিফলন। এই অস্বাভাবিক উষ্ণায়নের পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, ২০২৩-২৪ সালের এল নিনো বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে, যা বর্তমান উষ্ণায়ন প্রবণতা ত্বরান্বিত করেছে। দ্বিতীয়ত, মানব কার্যক্রম থেকে নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্রমাগত বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদি উষ্ণায়নের প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে।

২০২৪ সালে বাংলাদেশেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। জানুয়ারিতে তীব্র শৈত্যপ্রবাহে তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে, যা কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে। এপ্রিল মাসে ৭৬ বছরের মধ্যে রেকর্ডভাঙা তাপপ্রবাহ ঘটে, যা টানা ২৬ দিন স্থায়ী ছিল; এই সময়ে ঢাকায় তাপমাত্রা ৪০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে, যা জনজীবন ও কৃষি খাতে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। মে মাসে ঘূর্ণিঝড় রিমাল দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে, যার ফলে প্রায় ৩৭ লাখ ৫৮ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রায় ৩৫ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। আগস্ট মাসে ফেনী জেলায় ভারি বর্ষণ এবং উজান থেকে নেমে আসা ঢলে ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়, যেখানে ৯০ শতাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৪৮ শতাংশ বাড়িঘর ধ্বংস হয়। এই ঘটনাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরো স্পষ্ট করে তুলেছে এবং দেশের জন্য নতুন করে প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের আরেকটি প্রধান প্রভাব দেখা যায় বৃষ্টিপাতের প্যাটার্নে পরিবর্তনের মাধ্যমে। উচ্চ নির্গমন দৃশ্যপট (SSP585) পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫২.৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে এই বৃষ্টিপাত সমানভাবে বিতরণ হবে না। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং শুকনো মৌসুমে দীর্ঘ খরা কৃষি ও পানির সরবরাহব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। হাওর অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার কারণে ফসল উৎপাদন কমে যাবে। একই সঙ্গে বৃষ্টিপাতের অনিয়মিততা দেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে।

১৯৭৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে বাড়ছে। গবেষণায় বলা হচ্ছে, এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে একুশ শতকের শেষ নাগাদ সর্বোচ্চ নির্গমন পরিস্থিতিতে (SSP585) বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ৩.৭৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এমন তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাষ্পতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে, যা প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হতে পারে। বিশেষ করে দেশের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চল, যা জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ ছাড়া দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য (ডায়ার্নাল টেম্পারেচার রেঞ্জ বা DTR) উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। এর ফলে রাতের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে, যা মানুষ ও প্রাণিকুলের জন্য বিশ্রাম ও পুনরুদ্ধারপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের উষ্ণতার কারণে ঘূর্ণিঝড় আরো শক্তিশালী হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০৫০ সালের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে দেশের ১৭ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে চলে যেতে পারে এবং প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। এই বাস্তুচ্যুত মানুষের শহরমুখী প্রবাহ ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোতে চাপ আরো বাড়াবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করবে।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য এরই মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনুভব করছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের প্যাটার্নের পরিবর্তন প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির আবাসস্থলে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অঞ্চল, যা মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অতিরিক্ত বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে হুমকির মুখে পড়তে পারে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার বৃদ্ধি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ম্যানগ্রোভ বন ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংকটে পড়বে।

বাংলাদেশের কৃষি দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। গত কয়েক দশকে জলবায়ুর এই চেনা ছন্দে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে, যা ধান, গম, ভুট্টার মতো প্রধান ফসলের উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বাধা সৃষ্টি করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে, বর্ষা ও শীতকালের বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণে পরিবর্তন ঘটছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে কৃষি খাতে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষি খাত বড় সংকটের মুখোমুখি। দেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর, এবং দেশের ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান এই খাত থেকে আসে। তবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে ধান, যা দেশের প্রধান খাদ্যশস্য এবং কৃষির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত, তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের কারণে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ধানের ফলনের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। ধানের গাছ রাতের ঠান্ডা তাপমাত্রায় বেশি কার্যকরভাবে বাড়ে; কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। গবেষণাগুলো স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে রাতের তাপমাত্রা ২৪-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে উঠলে ধানের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে।

জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বোরো ধানের উৎপাদন ১৭ শতাংশ এবং গম উৎপাদন ৩২ শতাংশ কমে যেতে পারে। পেঁয়াজ, রসুন, আলু এবং অন্যান্য অর্থকরী ফসলও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর পাশাপাশি মাটির গুণগত মান নষ্ট হওয়ার কারণে কৃষিকাজের খরচ বাড়ছে। তা ছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পোকামাকড় ও রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়বে, যা কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। তাপমাত্রার পাশাপাশি বর্ষার অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং শুকনো মৌসুমে খরার ফলে সেচব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়বে এবং কৃষি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে। রাতের উচ্চ তাপমাত্রা ধানের ফলন কমিয়ে দেয়, এটি একটি গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। অন্যথায় বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো খরা, লবণাক্ততা ও বন্যা সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, যেমন–ব্রি ধান৭১, যা খরা সহনশীল। তবে রাত্রিকালীন তাপমাত্রা সহনশীল জাত উদ্ভাবনে এখনো বড় ধরনের অগ্রগতি হয়নি। রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট ক্ষতি মোকাবেলার জন্য এ ধরনের জাত উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে কৃষি খাতকে আরো স্থিতিশীল ও উৎপাদনশীল করা সম্ভব।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। AI প্রযুক্তি ফসলের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, রোগ ও পোকামাকড় শনাক্তকরণ এবং ফলন পূর্বাভাস প্রদান করতে পারে। এর মাধ্যমে কৃষকরা সঠিক সময়ে সেচ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে পারে, যা খরচ কমিয়ে উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক। স্মার্ট সেচ-প্রযুক্তি, উন্নত ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং মাটি ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার মাটির উর্বরতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এই প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ, সহজলভ্য প্রযুক্তি সরবরাহ এবং সরকারি নীতি সহায়তা অপরিহার্য।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারি নীতি ও আর্থিক সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সহজ শর্তে ঋণ ও ফসল বীমার সুযোগ দিলে কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন। পাশাপাশি জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন কৌশল বাস্তবায়নে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বৈশ্বিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে আরো বেশি সহায়তা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্ত সরকার প্যানেল (আইপিসিসি) ২০২১ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, কার্বন নিঃসরণ কমানো না গেলে ২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।

তবে সঠিক পরিকল্পনা, কার্যকর পদক্ষেপ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব। সরকারের পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমিয়ে একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই কেবল বাংলাদেশের নয়, এটি পুরো বিশ্বের জন্য একটি শিক্ষা। জীববৈচিত্র্য ও কৃষি খাত রক্ষায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ না নিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে পারে। গবেষণার ফলাফল আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে অভিযোজন ও প্রশমন কৌশল গ্রহণ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব নয়। ■

সুপারিশ

- সহজ শর্তে ঋণ ও ফসল বীমার সুযোগ দিলে কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন
- জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন কৌশল বাস্তবায়নে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার
- বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বৈশ্বিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি
- সরকারের পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমিয়ে একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে
- জীববৈচিত্র্য ও কৃষি খাত রক্ষায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে

দেশে কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিন
যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ১৪-০১-২০২৫ (পৃঃ ১১)

কেশবপুরে কোল্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত বোরো বীজতলা

■ স্বদেশ ডেস্ক

যশোরের কেশবপুরে কোল্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত বোরো বীজতলা। এর ফলে বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা। এদিকে, দিনাজপুরের কাহারোলে কুয়াশা ও ঠান্ডা থেকে বীজতলা রক্ষায় পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত-

কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি জানান, যশোরের কেশবপুরে প্রচন্ড ঠান্ডা বা কোল্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়ে বোরো ধানের বীজতলা ক্ষতির মুখে পড়েছে। তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক কৃষকের বীজতলা লালচে-সাদাবর্ণ হয়ে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে বোরো ধান আবাদ করতে চারা নিয়ে বিপাকে পড়ছেন কৃষকরা। কোল্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়ে বীজতলা লালচে হওয়ার খবর পেয়ে উপজেলা কৃষি অফিস থেকে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

জানা গেছে, জানুয়ারির শুরু থেকে এ উপজেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র থেকে মাঝারি ধরণের শৈত্যপ্রবাহ। এর সঙ্গে ঘন কুয়াশায় বোরো বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে কোল্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়ে বীজতলায় চারা লালচে বর্ণ ধারণ করে উপরের দিক থেকে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বীজতলা উৎপাদন নিয়ে অনেক কৃষক বিপাকে পড়েছেন।

উপজেলার মধ্যকুল গ্রামের কৃষক শাহীনুর রহমান বলেন, তার বোরো ধানের বীজতলা তীব্র শীতের কারণে লালচে বর্ণ ধারণ করেছে। বীজতলা স্বাভাবিক ফিরে না এলে বোরো আবাদ নিয়ে বিপাকে পড়তে হবে। কৃষি অফিসের পরামর্শ বীজতলা পরিচর্যা শুরু করা হচ্ছে।

মঙ্গলকোট গ্রামের কৃষক আব্দুল বারী বলেন, তিনি বোরো আবাদের জন্য দুই কাঠা জমিতে বীজতলা করেছেন। কয়েক দিনের শৈত্যপ্রবাহ আর ঘন কুয়াশায় বীজতলা ক্ষতির মুখে পড়েছে। চারাগুলো হলুদ হয়ে গেছে।

কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে কেশবপুর উপজেলায় বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ হাজার ৪২৫ হেক্টর। এর জন্য ৭২১ হেক্টর বীজতলার প্রয়োজন।

ভারপ্রাপ্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, চলতি বছর ভয়াবহ বন্যার কারণে নিম্নাঞ্চলের কৃষকদের বোরোর বীজতলা তৈরিতে বিলম্ব হয়। সম্প্রতি তীব্র শীতের কারণে কিছু কিছু বীজতলা কোল্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়েছে। বীজতলা রক্ষা করতে কৃষকদের প্রতি রাতে বীজতলায় পানি জমিয়ে সকালে ছেড়ে দিতে হবে। ঘন কুয়াশা থেকে রক্ষার জন্য প্রতি রাতে পলিথিন দিয়ে চারার বেড ঢেকে রাখতে হবে। সকালে বীজতলা থেকে কুয়াশা ঝেড়ে ফেলার পাশাপাশি ছত্রাকনাশক থিয়োভিট, কুইক পটাশ অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

কাহারোলে বীজতলা রক্ষায় পলিথিনের ব্যবহার

এদিকে, **কাহারোল (দিনাজপুর) প্রতিনিধি** জানান, কাহারোলে কুয়াশা ও ঠান্ডা থেকে বীজতলা রক্ষায় পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে বোরো ধান চাষিরা বীজতলাকে ঘন কুয়াশা ও তীব্র ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পলিথিন ব্যবহার করছেন। এতে একদিকে যেমন-কুয়াশা ও ঠান্ডার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাচ্ছে, অন্যদিকে চারাগুলো পলিথিনের নীচে সতেজ থাকছে বলে অনেক কৃষক জানান।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে বোরো ধান চাষাবাদে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমি। সে অনুযায়ী বীজতলার লক্ষ্যমাত্রা ২৭৮ হেক্টর জমি। উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের ঈশানপুর গ্রামের বোরো ধান চাষি সামসুল ইসলাম জানান, তিনি চলতি ইরি-বোরো মৌসুম ৬ একর জমিতে বোরো ধান চাষাবাদ করবেন। সে জন্য আগাম জাতের বোরো ধানের বীজ বপন করেছেন। শীত ও ঘন কুয়াশায় হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বীজগুলোকে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখছেন।

অপর চাষি মফিজ উদ্দীন তিনি বলেন, 'আমি ৭ একর জমিতে ইরি-বোরো ধান চাষাবাদ করবো। এ জন্য ব্রি-ধান ২৯ ও ব্রি-ধান ৮৯ জাতের বীজ জমিতে বপন করেছি এবং সম্পূর্ণরূপে বীজগুলোকে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। যাতে করে বীজগুলো ভালো থাকে।'

এ দিকে উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মল্লিকা রানী সেহানবীশ জানান, উপজেলার কৃষকদের বীজতলাগুলোকে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, যাতে করে বীজতলা নষ্ট না হয়। এ বিষয়ে কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে আসছে কৃষি বিভাগ।